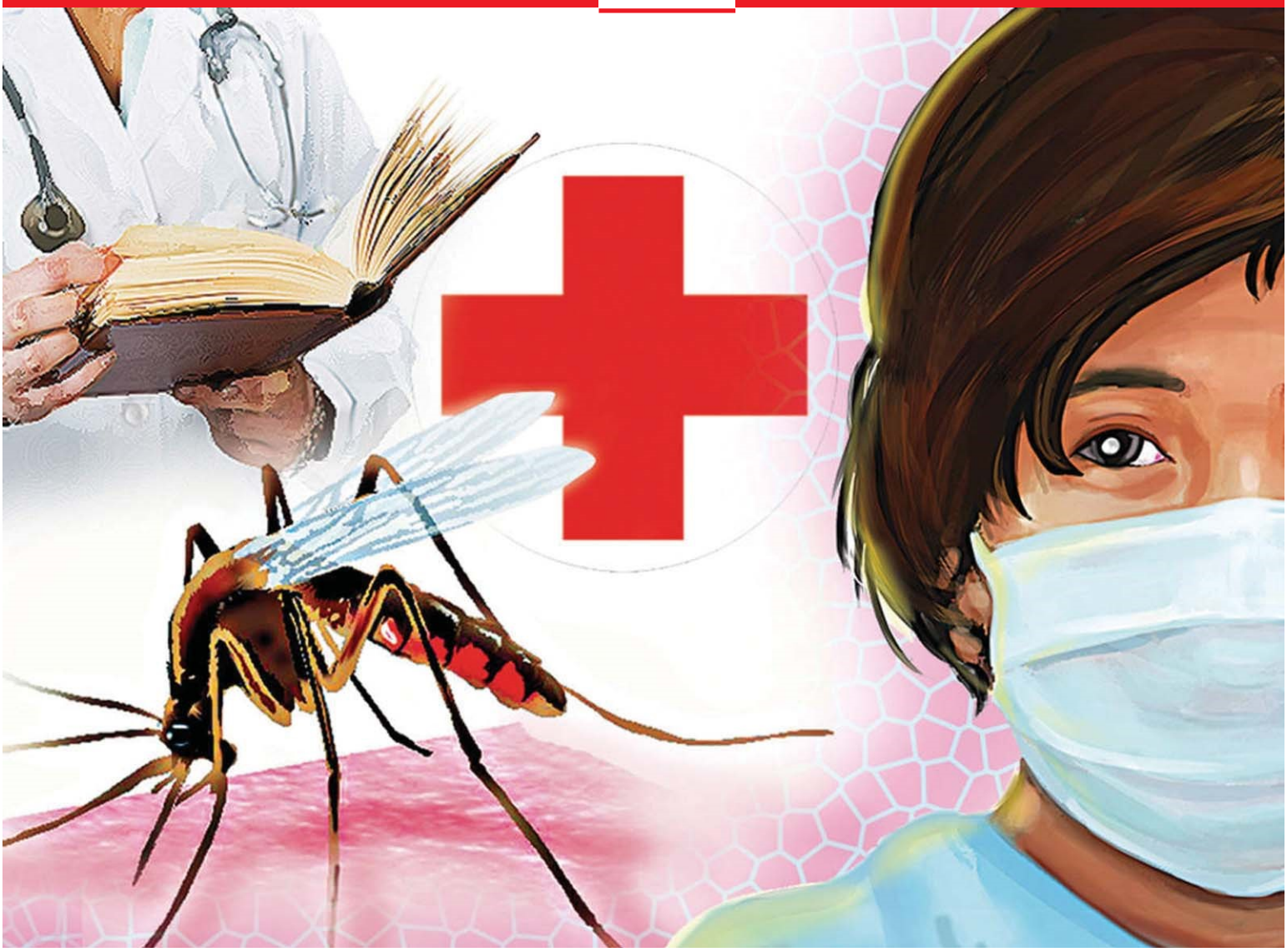

# ডেঙ্গুজ্বর তথ্য ও পথ্য

বাংলাদেশে প্রায় দুই দশক ধরে প্রতি বছরই আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে মানুষ কমবেশি ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে থাকে। এবার একটু আগেভাগেই শুরু হয়েছে ডেঙ্গু জ্বরের প্রকোপ। মাঝে মধ্যে নতুন রূপ নিয়ে আসে ভাইরাসটি, এবারও রূপ পাল্টেছে এ ভাইরাসটি এবং আক্রান্তের সংখ্যাটিও আগের চেয়ে অনেক বেশি। দেশের বহুল প্রচারিত একটি দৈনিক পত্রিকার তথ্য সূত্রে ২২ জুলাই পর্যন্ত সারা দেশে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্তের সংখ্যা এরই মধ্যে সাড়ে তিন লাখ ছাড়িয়ে গেছে বলে উল্লেখ করা হয়। স্বাস্থ্য অধিদফতরের রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখার তথ্য বিশ্লেষণ করে আক্রান্তের এই অনুমিত সংখ্যা পাওয়া গেছে। সূত্রটিতে আরো উল্লেখ করা হয়েছে, ডেঙ্গুতে আক্রান্ত সব রোগী সরকারি নজরদারির মধ্যে নেই। চিকিৎসা নিতে আসা মাত্র ২ শতাংশ রোগী সরকারি নজরদারির মধ্যে পড়ে। এই অনুমিত হিসাব তৈরিতে স্বাস্থ্য অধিদফতরকে সহায়তা করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। বিভিন্ন সূত্র মতে, চলতি বছর ইতোমধ্যে ডেঙ্গুতে ২৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। সরকারের স্বাস্থ্য অধিদফতরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুমের তথ্য অনুযায়ী, এ বছরের জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত সাত হাজার ১৭৯ জন রোগী ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। ডেঙ্গু ইতোমধ্যেই দেশবাসীকে আতঙ্কিত করে তুলেছে। নিয়ন্ত্রণহীন এই ডেঙ্গু জ্বর থেকে কিভাবে রক্ষা পাওয়া যায়, সর্বোপরি দেশের মানুষ যাতে ডেঙ্গু জ্বরের প্রকোপ থেকে রক্ষা পায়, এ জন্য দেশের বহুলপ্রচারিত স্বাস্থ্য পত্রিকা হেলথ ম্যাগাজিনে প্রকাশের জন্য স্বনামধন্য মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ও বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন অনুষদের সাবেক ডিন **প্রফেসর ডা: এ বি এম আব্দুল্লাহ** একটি তথ্যবহুল লেখা এবং এ সম্পর্কিত নানা জটিলতার আশু সমাধানকল্পে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আমাদের কৃতার্থ করেছেন। সম্মানিত লেখককে হেলথ ম্যাগাজিনের পক্ষ থেকে এ জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আশা করি, হেলথ ম্যাগাজিনের পাঠকসহ দেশের অগণিত মানুষ এতে উপকৃত হবেন।

মে থেকে অক্টোবর মাস বিশেষ করে বর্ষাকালে থাকে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব। এটা শীতের আগমনের আগ পর্যন্ত চলতেই থাকবে। কিন্তু ২০১৯ সালের প্রায় শুরু থেকেই বেড়ে চলেছে ডেঙ্গু জ্বরের প্রকোপ, কারণ মাঝে মাঝে হালকা বৃষ্টিতে জমে থাকা পানি ডেঙ্গুবাহিত এডিস মশার প্রধান প্রজনন ক্ষেত্র। ফলে মশার বংশ বৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়ে বাড়ছে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা। যেহেতু বর্তমান মৌসুমটা ডেঙ্গু জ্বরের, আর মশার প্রকোপ এবং এর বংশ বৃদ্ধি কমানো যায়নি, তাই যে কেউ এই সময়ে জ্বরে আক্রান্ত হলে ডেঙ্গু জ্বরের কথা মাথায় রাখতে হবে। সাধারণ জ্বর মনে করে অবহেলা না করে, ডাক্তারের পরামর্শ নেয়া উচিত। কারণ অহেতুক অবহেলার কারণে এবছর ডেঙ্গু আক্রান্ত বেশ কিছু রোগীর মৃত্যুর ঘটনা জনগণকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলেছে। যদিও গত কয়েক বছরে ডেঙ্গু নিয়ে অযথা আতঙ্ক অনেকটাই কমে এসেছে। তারপরও রয়ে গেছে নানা প্রশ্ন।

ডেঙ্গু কোনো নতুন রোগ নয়, এর উপসর্গের সাথে মিল আছে এমন জ্বরের প্রথম মহামারীর ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায় ৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে চীনে (যা 'পানি বিষ' নামে বর্ণিত)। পরবর্তীকালে ১৬৩৫ খ্রিষ্টাব্দে ফরাসি ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও ১৬৬৯ খ্রিষ্টাব্দে পানামায় যে জ্বরের (ক্যু দ্য র্বা) মহামারীর বিবরণ পাওয়া যায়, সেটি ডেঙ্গু বলেই ধারণা করা হয়। ১৭৭৯ খ্রিষ্টাব্দে একই সাথে মহামারীর বিবরণ পাওয়া যায় কায়রো (ম্যাল দ্য জেন্যু) এবং বাটাভিয়ায় (নকেলকুর্টস বা বোন ফিভার) এবং ১৭৮০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়ায় (বিলিয়াস রেমিটিং ফিভার বা ব্রেকবোন ফিভার)। এশিয়াতে ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভারের প্রথম মহামারী হয় ১৯৫৩-৫৪ সালে ম্যানিলায় এবং পরবর্তীকালে ১৯৫৮ সালে ব্যাংকক ও থাইল্যান্ডে। বাংলাদেশে ডেঙ্গু জ্বরের প্রথম ব্যাপক আক্রমণের বিবরণ পাওয়া যায় ১৯৬৪ সালে, যা পরিচিত ছিল 'ঢাকা ফিভার' নামে।

এই শতাব্দীর শুরুতে ২০০০ সালে ডেঙ্গু জ্বর বিশেষ করে রাজধানী ঢাকায় ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ে। মানুষ হয়ে পড়ে আতঙ্কগ্রস্ত। রোগাক্রান্ত ব্যক্তি এবং পরিবার-পরিজন অনেকেই হয়ে পড়েন দিশাহারা। শত শত রোগীর রক্ত এবং প্লাটিলেট জোগাড় করতে গিয়ে ব্লাড ব্যাংকগুলো রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছিল। আর রক্ত বা প্লাটিলেট সংগ্রহ করার জন্য লোকজনও হয়ে উঠেছিল মরিয়া। এ সময়টাতে চিকিৎসকদের অভিজ্ঞতাও ছিল সীমিত। ফলে পুরো জাতিই দিগ্বিদিক শূন্য এবং ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। মিডিয়ায়ও এর ব্যাপক প্রচার পায়। তবে বর্তমানে মানুষের ওই ভীতি ও আতঙ্ক বহুলাংশে কেটে গেছে। ডাক্তাররা এখন যথেষ্ট অভিজ্ঞ ও দক্ষ। জনগণও এর প্রতিকার এবং প্রতিরোধে যথেষ্ট সচেতন।

ডেঙ্গু জ্বরের উৎপত্তি ডেঙ্গু ভাইরাস দ্বারা, সাধারণত এডিস ইজিপটাই নামক মশার কামড়ে এই ভাইরাস মানুষের দেহে প্রবেশ করে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এডিস অ্যালবপটিকাস নামক মশার কামড়েও এই রোগ ছড়াতে পারে। ডেঙ্গু জ্বরের জীবাণুবাহী মশা কোনো ব্যক্তিকে কামড়ালে, সেই ব্যক্তি চার থেকে ছয় দিনের মধ্যে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়। এবার এই আক্রান্ত ব্যক্তিকে কোনো জীবাণুবিহীন এডিস মশা কামড়ালে, সেই মশাটিও ডেঙ্গু জ্বরের জীবণুবাহী মশায় পরিণত হয়। এভাবে একজন থেকে অন্যজনে মশার মাধ্যমে ডেঙ্গু ছড়িয়ে থাকে।

ডেঙ্গু জ্বর কখন ও কাদের বেশি হয়? সাধারণত শহরাঞ্চলে অভিজাত এলাকায়, বড় বড় দালানকোঠায় এই মশার প্রাদুর্ভাব বেশি। তাই ডেঙ্গু জ্বরও এই এলাকার বাসিন্দাদের বেশি হয়। বস্তিতে বা গ্রামে বসবাসরত লোকজনের ডেঙ্গু এবোরেই হয় না বললেই চলে। ডেঙ্গু ভাইরাস চার ধরনের– ডেন-১, ডেন-২, ডেন-৩ ও ডেন-৪। তাই ডেঙ্গু জ্বরও চারবার হতে পারে। যারা একবার ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়েছে, তাদের পরবর্তী সময়ে ডেঙ্গু হলে তা মারাত্মক হওয়ার ঝুঁকি থাকে।

## ডেঙ্গু জ্বরের লক্ষণ

ডেঙ্গু প্রাধানত দুই ধরনের– ক্লাসিক্যাল ডেঙ্গু ফিভার এবং ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভার।

**ক্লাসিক্যাল ডেঙ্গু জ্বর :** সাধারণত তীব্র জ্বর ও সেই সাথে সারা শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা হয়। জ্বর ১০৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত উঠতে পারে। শরীরে বিশেষ করে হাড়, কোমর, পিঠসহ অস্থিসন্ধি, মাংসপেশি মাথাব্যথা ও চোখের পেছনে তীব্র ব্যথা হয়। এমনকি ব্যথা এত তীব্র হয়, মনে হয় হাড় বুঝি ভেঙে যাচ্ছে। তাই এই জ্বরের আরেক নাম 'ব্রেকবোন ফিভার'। শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যথার তীব্রতায় শিশুকে স্পর্শ করলেই কেঁদে ওঠে, খিটখিটে মেজাজের হয়। জ্বর হওয়ার চার বা পাঁচ দিনের সময় সারা শরীরে লালচে দানা দেখা যায়, যাকে বলা হয় স্কিন র‍্যাশ। অনেকটা অ্যালার্জি বা ঘামাচির মতো। এর সাথে বমি বমি ভাব, এমনকি বমি হতে পারে। রোগী অতিরিক্ত ক্লান্তিবোধ করে এবং রুচি কমে যায়। সাধারণত চার বা পাঁচ দিন জ্বর থাকার পর তা এমনিতেই চলে যায় এবং কোনো কোনো রোগীর দুই বা তিন দিন পর আবার জ্বর আসে। একে বাইফেজিক ফিভার বলে।

**ডেঙ্গু হেমোরেজিক জ্বর :** এ অবস্থাটাই সবচেয়ে জটিল, যেখানে ক্লাসিক্যাল ডেঙ্গু জ্বরের লক্ষণ ও উপসর্গের পাশাপাশি আরো

কিছু সমস্যা হয়। জ্বরের চার-পাঁচ দিন পরে রক্তের প্লাটিলেট কমে যায়, ফলে শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে রক্তপাত, চামড়ার নিচে, নাক ও মুখ দিয়ে, মাড়ি ও দাঁত হতে, কফের সাথে রক্তবমি, পায়খানার সাথে তাজা রক্ত বা কালো পায়খানা, চোখের মধ্যে এবং চোখের বাহিরে, মেয়েদের বেলায় সময়ের আগেই মাসিক হওয়া বা মাসিকের সময় অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ ইত্যাদি। এমনকি মস্তিষ্ক এবং হার্টেও রক্তক্ষরণ হতে পারে। ফলে হাইপোভলিউমিক শকে গিয়ে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। তা ছাড়া বুকে পানি এবং শ্বাসকষ্ট, পেটে পানি, লিভার আক্রান্ত হয়ে জন্ডিস, কিডনি আক্রান্ত হয়ে রেনাল ফেইলিউর ইত্যাদি জটিলতা দেখা দিতে পারে।

**ডেঙ্গু শক সিনড্রোম :** ডেঙ্গু জ্বরের ভয়াবহ রূপ হলো 'ডেঙ্গু শক সিনড্রোম'। ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভারের সাথে সার্কুলেটরি ফেইলিউর হয়ে ডেঙ্গু শক সিনড্রোম হয়। এর লক্ষণ হলো– রক্তচাপ হঠাৎ কমে যাওয়া, নাড়ির স্পন্দন অত্যন্ত ক্ষীণ ও দ্রুত হয়, হাত-পা ও অন্যান্য অংশ ঠাণ্ডা হয়ে যায়, প্রস্রাব কমে যায়। হঠাৎ করে রোগী অজ্ঞান হতে পারে। এমনকি মৃত্যুও হতে পারে। যারা মারা গেছেন, তারা 'ডেঙ্গু শক সিড্রোমে'ই আক্রান্ত হয়েছিলেন।

**বর্তমানে ডেঙ্গুর ধরন :** এবারে অধিকাংশে রোগীর ক্ষেত্রে রোগের লক্ষণের ভিন্নতা দেখা যাচ্ছে। জ্বরের তীব্রতা, শরীরে তীব্র ব্যথা এবং র‍্যাশ পরিলক্ষিত হচ্ছে না, তারা সাধারণ জ্বর মনে করে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সময়ক্ষেপণ করছেন এবং যথাযথ চিকিৎসা নিতে বিলম্ব করছেন। ফলে কিছু বুঝে ওঠার আগেই অনেক রোগীর অবস্থার হঠাৎ অবনতি হচ্ছে, কোনো কোনো রোগী হেমোরেজিক ডেঙ্গু বা ডেঙ্গু শক সিনড্রোমের মতো মারাত্মক জটিলতা নিয়ে হাসপাতালে আসছেন। শেষ মুহূর্তে ডাক্তারদেরও হিমশিম খেতে হচ্ছে চিকিৎসা করতে। ভোগান্তি বাড়ছে রোগীদের।

**কী কী পরীক্ষা করা উচিত :** আসলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ডেঙ্গুজ্বর হলে খুব বেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার দরকার নেই, এতে অযথা অর্থের অপচয় হয়। রক্তের প্লাটিলেট কাউন্ট জ্বর শুরুর চার বা পাঁচ দিন পর কমতে শুরু করে। তাই চার বা পাঁচ দিন পর রক্তের সিবিসি এবং প্লাটিলেট পরীক্ষা করা উচিত। এর আগে করলে রিপোর্ট স্বাভাবিক থাকে এবং অনেক বিভ্রান্তিতে পড়তে পারেন। রোগী এমনকি ডাক্তারও মনে করতে পারেন যে রিপোর্ট ভালো আছে। তাই আর কোনো পরীক্ষার প্রয়োজন নেই। আবার অনেকেই দিনে দু-তিনবার এবং একই সাথে একাধিক ল্যাবরেটরি থেকে প্লটিলেট কাউন্ট করে থাকেন, যা অপ্রয়োজনীয়। প্লাটিলেট কাউন্ট এক লাখের কম হলে, ডেঙ্গু ভাইরাসের কথা মাথায় রেখে পরবর্তী পদক্ষেপ নেয়া উচিত। পাশাপাশি ১-২ দিনের জ্বরে ডেঙ্গু এনএস-১ এন্টিজেন এবং চার থেকে ছয় দিন পর অ্যান্টি-ডেঙ্গু অ্যান্টিবডি করা যেতে পারে। এই পরীক্ষাগুলো রোগ শনাক্তকরণে সাহায্য করলেও চিকিৎসায় কোনো ভূমিকা নেই। এই পরীক্ষা না করলেও কোনো সমস্যা নেই। এতে শুধু অর্থের অপচয় হয়। চিকিৎসক যদি মনে করেন, তবে প্রয়োজনে ব্লাড সুগার, লিভারের পরীক্ষা, পেটের আল্ট্রাসনোগ্রাম, বুকের এক্স-রে এবং ডিআইসি জাতীয় জটিলতার পরীক্ষা করতে পারবেন।

**চিকিৎসা পদ্ধতি :** ডেঙ্গু জ্বরের নির্দিষ্ট কোনো চিকিৎসা নেই। এই জ্বর সাধরণত এমনিতেই ভালো হয়ে যায়, এমনকি কোনো চিকিৎসা না করালেও। তবে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে, যাতে ডেঙ্গুজনিত কোনো জটিলতা না হয়। ডেঙ্গু যেহেতু ভাইরাসজনিত, তাই উপসর্গ অনুযায়ী চিকিৎসা দেয়া হয়। জ্বর হলে শুধু প্যারাসিটামল খেতে পারেন। অন্য কোনো ব্যথার ওষুধ যেমন এসপিরিন, ডাইক্লোফেনাক, আইকপ্রোফেন কোনোক্রমেই খাওয়া যাবে না। এতে রক্তক্ষরণের ঝুঁকি বাড়বে। প্রচুর পানি এবং তরল খাওয়ানো উচিত। খেতে না পারলে বা অন্য কোনো প্রয়োজনে শিরাপথে স্যালাইন বা গ্লুকোজ ইত্যাদি দেয়া যেতে পারে। কিছু কিছু লক্ষণ দেখা দিলে অতিসত্বর ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। যেমন– প্লাটিলেটের মাত্রা কমে গেলে, শরীরের যেকোনো অংশ থেকে রক্তপাত হলে, প্রস্রাবের পরিমাণ কমে গেলে, জন্ডিস দেখা দিলে, অতিরিক্ত ক্লান্তি বা দুর্বলতা দেখা দিলে, প্রচণ্ড পেটে ব্যথা বা বমি হলে। এসব ক্ষেত্রে অবহেলা না করে অবশ্যই রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করাতে হবে। ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীকে সব সময় মশারির মধ্যে রাখতে হবে, যাতে কোনো মশা কামড়াতে না পারে। কারণ, আক্রান্ত রোগীকে কামড়ানো মশা অন্য সুস্থ মানুষকে কামড়ালে তার ডেঙ্গু জ্বর হতে পারে এবং এভাবেই ডেঙ্গু অন্যদের মাঝে ছড়ায়।

**ডেঙ্গু জ্বর কিভাবে প্রতিরোধ করা যায় :** ডেঙ্গুর কোনো ভ্যাক্সিন নেই। যেহেতু ডেঙ্গু ভাইরাস চার টাইপের। তাই এ চারটি ভাইরাসের প্রতিরোধে কাজ করে, এমন ভ্যাক্সিন আবিষ্কার হয়নি। ডেঙ্গু জ্বর প্রতিরোধের মূলমন্ত্রই হলো এডিস মশার বিস্তার রোধ এবং এই মশা যেন কামড়াতে না পারে তার ব্যবস্থা করা। মনে রাখতে হবে, এডিস একটি ভদ্র মশা, অভিজাত এলাকায় বড় বড় সুন্দর দালানকোঠায় এরা বাস করে। স্বচ্ছ পরিষ্কার পানিতে এই মশা ডিম পাড়ে। ময়লা দুর্গন্ধযুক্ত ড্রেনের পানি এদের পছন্দ নয়। তাই ডেঙ্গু প্রতিরোধে এডিস মশার

ডিম পাড়ার উপযোগী স্থানগুলোকে পরিষ্কার রাখতে হবে এবং একই সাথে মশক নিধনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। এই রোগ থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হলো ব্যক্তিগত সতর্কতা এবং এডিস মশা প্রতিরোধ।

**ব্যক্তিগত সতর্কতা :**
এডিস মশা মূলত দিনের বেলায়, সকাল ও সন্ধ্যায় কামড়ায়, তবে রাতে উজ্জ্বল আলোতেও কামড়াতে পারে।
দিনের বেলায় যথাসম্ভব শরীর ভালোভাবে কাপড়ে ঢেকে রাখতে হবে, মশার কামড় থেকে বাঁচার জন্য দিন ও রাতে মশারি ব্যবহার করতে হবে।
প্রয়োজনে মসকুইটো রিপেলেন্ট, স্প্রে, লোশন বা ক্রিম, কয়েল, ম্যাট ব্যবহার করা যেতে পারে। দরজা-জানালায় নেট লাগাতে হবে।
শিশুদের হাফপ্যান্টের বদলে ফুলপ্যান্ট বা পায়জামা পরাতে হবে।

**বসতবাড়ির মশা নিধন :** যেহেতু এডিস মশা মূলত এমন বস্তুর মধ্যে ডিম পাড়ে যেখানে স্বচ্ছ পানি জমে থাকে, তাই ফুলদানি, অব্যবহৃত কৌটা, বাড়িঘরে এবং আশপাশে যেকোনো পাত্র বা জায়গায় জমে থাকা পানি তিন থেকে পাঁচ দিন পরপর ফেলে দিলে এডিস মশার লার্ভা মারা যায়। পাত্রের গায়ে লেগে থাকা মশার ডিম অপসারণে পাত্রটি ঘষে পরিষ্কার করলে ভালো। ঘরের বাথরুমে কোথাও জমানো পানি পাঁচ দিনের বেশি যেন না থাকে। একুরিয়াম, ফ্রিজ বা এয়ারকন্ডিশনারের নিচে এবং মুখ খোলা পানির ট্যাংকে যেন পানি জমে না থাকে, সে ব্যবস্থা করতে হবে। বাড়ির ছাদে অনেককে বাগান করতে দেখা যায়, সেখানে টবে বা পাত্রে যেন জমা পানি পাঁচ দিনের বেশি না থাকে সেদিকেও যত্নবান হতে হবে। বাড়ির আশপাশের ঝোপঝাড়, জঙ্গল, জলাশয় ইত্যাদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

**বসতবাড়ির বাইরে মশার বংশ বিস্তার রোধ :**
ঘরের বাইরে মাঝে মাঝে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হওয়ার ফলে পানি জমতে পারে। যেমন ফুলের টব, প্লাস্টিকের পাত্র, পরিত্যক্ত টায়ার, প্লস্টিকের ড্রাম, মাটির পাত্র, টিনের কৌটা, ডাবের খোল, কনটেইনার, মটকা, ব্যাটারির শেল, পলিথিন বা চিপসের প্যাকেট। এসব জায়গায় জমে থাকা পানি পরিষ্কার করতে হবে।

মশা নিধনের জন্য স্প্রে বা ফগিং করতে হবে। বিভিন্ন রাস্তায় আইল্যান্ডে সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য ফুলের টব, গাছপালা, জলাধার ইত্যাদি দেখা যায়। এখানে বৃষ্টির পানি জমে থাকতে পারে। এগুলোতেও যেন পানি জমে না থাকে, সে ব্যাপারে যত্নবান হতে হবে।

**ডেঙ্গু নিয়ে খুব স্বভাবতই জনমনে যেসব প্রশ্ন জাগে :**

**প্রশ্ন : ডেঙ্গু থেকে জীবনাশঙ্কা আছে কি?**
উত্তর : ডেঙ্গু জ্বর তেমন মারাত্মক কোনো রোগ নয়। তবে ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভার ও ডেঙ্গু শক সিন্ড্রোম প্রাণঘাতী হতে পারে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সময়মতো চিকিৎসা নিলে প্রাণহানির আশঙ্কা ১ শতাংশেরও কম। তাই আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই।

**প্রশ্ন : জ্বর কমে গেলে কি সব বিপদ কেটে গেল?**
উত্তর : ডেঙ্গু জ্বর সাধারণত পাঁচ-ছয় দিন থাকে এবং তারপর জ্বর সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যায়। জ্বর কমে গেলে অনেক রোগী এমনকি ডাক্তারও মনে করেন, রোগ সম্পূর্ণ ভলো হয়ে গেছে। কিন্তু ডেঙ্গু জ্বরে মারাত্মক সমস্যা হওয়ার সময় আসলে এটাই। এ সময়ই প্লাটিলেট কমে যায় এবং রক্তক্ষরণসহ নানা জটিলতা দেখা দিতে পারে। জ্বর কমে যাওয়ার পরবর্তী সময়টাকে তাই বলা হয় 'ক্রিটিক্যাল পিরিয়ড'। এ সময় সবারই সচেতন থাকা এবং চিকিৎসকের পরামর্শ অত্যন্ত জরুরি।

**প্রশ্ন : ডেঙ্গু জ্বরে কী কী পরীক্ষা কখন করা উচিত?**
উত্তর : সাধারণত বেশি টেস্ট করার প্রয়োজন হয় না। সিবিসি এবং প্লটিলেট কাউন্ট করলেই যথেষ্ট। তবে জ্বরের শুরুতে রক্ত পরীক্ষা করালে রিপোর্ট স্বাভাবিক থাকবে এবং তা রোগ নির্ণয়ে

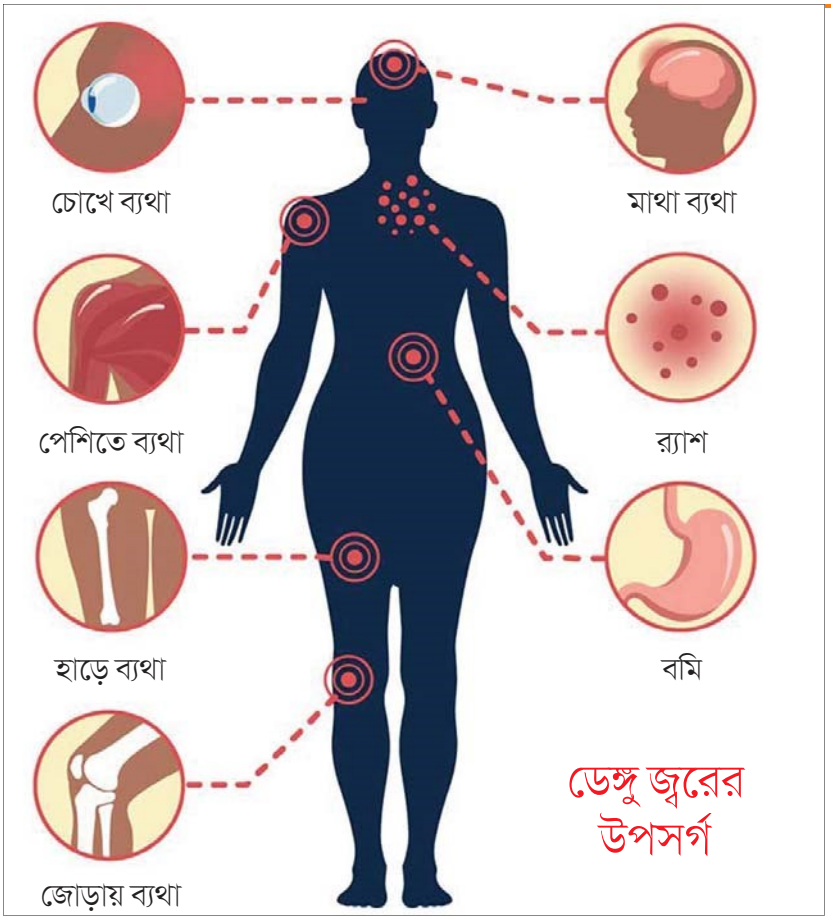


বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে। রোগী এমনকি ডাক্তারও মনে করতে পারেন রিপোর্ট ভালো আছে, তাই আর কোনো পরীক্ষার প্রয়োজন নেই, যা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। প্লটিলেট কাউন্ট চার বা পাঁচ দিন পর কমতে শুরু করে, তাই জ্বর শুরুর চার-পাঁচ দিন পর রক্ত পরীক্ষা করা উচিত। আবার অনেকেই দিনে কয়েকবার এমনকি একই সাথে বিভিন্ন ল্যাবরেটরি থেকে প্লাটিলেট কাউন্ট করে থাকেন, যা অপ্রয়োজনীয়। এক-দুই দিনের জ্বরে ডেঙ্গু এনএস-১ এন্টিজেন এবং চার থেকে ছয় দিন পর অ্যান্টি-ডেঙ্গু অ্যান্টিবডি করা যেতে পারে। এই পরীক্ষাগুলো রোগ শনাক্তকরণে সাহায্য করলেও চিকিৎসায় কোনো ভূমিকা নেই।

**প্রশ্ন : রক্ত পরিসঞ্চালনের প্রয়োজনীয়তা আছে কি?**

উত্তর : ডেঙ্গু জ্বর হলেই রোগী এবং চিকিৎসক উভয়ের রক্ত পরিসঞ্চালনের জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন। অথচ যদি রক্তক্ষরণ না হয় এবং রোগীর রক্তের হিমোগ্লোবিন স্বাভাবিক থাকে, তবে রক্ত পরিসঞ্চালন করার কোনো প্রয়োজন নেই।

**প্রশ্ন : প্লাটিলেট কি দিতেই হবে?**

উত্তর : ডেঙ্গু জ্বরের চার বা পাঁচ দিন পরে প্লাটিলেট কমতে থাকে, দু-তিন দিন পর তা বাড়তে শুরু করে, এমনকি কোনো চিকিৎসা ছাড়াই। তাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্লটিলেট পরিসঞ্চালনের কোনো প্রয়োজন হয় না। অনেক সময় প্লাটিলেট একটু কমে গেলেই রোগী এবং চিকিৎসক প্লাটিলেট পরিসঞ্চালনের জন্য ব্যস্ত হয় পড়েন, যা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অপ্রয়োজনীয়। আবার তাড়াহুড়ো করে প্লাটিলেট এমনকি রক্ত পরিসঞ্চালন করলে হেপাটাইটিস বি, সি, এইচআইভি ইত্যাদি সংক্রমণের ঝুঁকি থাকে।

**প্রশ্ন : একবার ডেঙ্গু হলে আর কি হয় না?**

উত্তর : এ ধারণাটি সম্পূর্ণ ভুল। কেননা ডেঙ্গু ভাইরাসের চারটি ভিন্ন প্রজাতি বা সেরোটাইপ আছে, তাই চারবার ডেঙ্গু হওয়ার আশঙ্কা থাকে। ডেঙ্গু ভাইরাসের যেকোনো একটি প্রজাতি দ্বারা একবার আক্রান্ত হয়ে সুস্থ হয়ে ওঠার পর ভবিষ্যতে সেই সেরোটাইপ দ্বারা আর আক্রান্ত হয় না। কারণ, শুধু সেই সেরোটাইপটিতে রোগীর আজীবন প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে ওঠে। কিন্তু বাকি তিনটি প্রজাতি দ্বারা ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি ঠিকই রয়ে যায়। তবে কেউ যদি পৃথকভাবে ডেঙ্গু ভাইরাসের চারটি প্রজাতি দ্বারা জীবনে চারবার ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে থাকেন, তাহলে বাকি জীবনে আর ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হওয়ার কথা নয়।

**প্রশ্ন : মা ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত অবস্থায় শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানো যাবে কি?**

উত্তর : মায়ের বুকের দুধে এই ভাইরাস থাকে না। কাজেই আক্রান্ত অবস্থায় মা শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াতে পারবেন।

**প্রশ্ন : ডেঙ্গু কি ছোঁয়াচে রোগ?**

উত্তর : ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে একত্রে থাকা যাবে কি? ডেঙ্গু কোনো ছোঁয়াচে রোগ নয়। কাজেই ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত রোগীকে স্পর্শ করলে, একই বিছানায় ঘুমালে, একই তোয়ালে, একই গ্লাস কিংবা প্লেট ব্যবহার করলে অন্যদের এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সুযোগ নেই। ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত রোগীর সাথে সামাজিক মেলামেশায় কোনো বাধা নেই।

**প্রশ্ন : অ্যান্টিবায়োটিক দেয়া যাবে কি?**

উত্তর : ডেঙ্গু ভাইরাসজনিত রোগ। এতে অ্যান্টিবায়োটিকের কোনো ভূমিকা নেই। তবে ডেঙ্গুর সাথে অন্য ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগও থাকতে পারে। তখন অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োজন হতে পারে। অনেকে মনে করেন, ডেঙ্গুতে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করলে রোগীর ক্ষতি হতে পারে এবং তা পরিহার করতে হবে, যা একটি ভুল ধারণা। ডেঙ্গু জ্বরে প্রয়োজনে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারে রোগীর কোনো ক্ষতি হবে না।

**প্রশ্ন : গর্ভাবস্থায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হলে কী করণীয়?**

উত্তর : এ ক্ষেত্রে অবশ্যই ডাক্তাররের পরামর্শ অনুযায়ী হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নিতে হবে। কারণ মা ও শিশু উভয়ের জন্যই এ সময়টি ঝুঁকিপূর্ণ।

উপসংহারে বলা যয়, ডেঙ্গু জ্বর হয়তো বা নির্মূল করা যাবে না। এর কোনো ভ্যাক্সিন কিংবা কার্যকর ওষুধও আবিষ্কৃত হয়নি। ডেঙ্গু জ্বরের মশাটি আমাদের দেশে আগেও ছিল, এখনো আছে, মশা প্রজনন এবং বংশ বৃদ্ধির পরিবেশও আছে। তাই ডেঙ্গু জ্বর ভবিষ্যতেও থাকবে। একমাত্র সচেতনতা ও প্রতিরোধের মাধ্যমেই এ থেকে মুক্তি সম্ভব।

অধ্যাপক ডা: এ বি এম আব্দুল্লাহ
সাবেক ডিন, ফ্যাকাল্টি অব মেডিসিন
প্রফেসর, ডিপার্টমেন্ট অব ইন্টারনাল মেডিসিন
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়
শাহবাগ, ঢাকা-১২০৫